শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

দাঙ্গার ইতিহাস

DANGAR ITIHAS
A History of Raiots by Saileshkumar Banerjee
Published by : Mitra & Ghosh Publishers Pvt Ltd.
10, Shyama Charan Dey Street, Calcutta 700 073

ISBN - 81-7293 - 085 - 2

॥ ৬ ॥

কলকাতা—নোয়াখালি—বিহার—পাঞ্জাব—দিল্লী ও সর্বত্র

১৯৪১ খ্রী থেকে ১৯৪৬ খ্রী গোড়ার দিক পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান বিবাদের প্রকোপ কম ছিল। খুব সম্ভব ইংরেজ সরকার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কারণে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বিব্রত থাকায় ভেদনীতির খেলাটা তেমন জমিয়ে খেলতে পারে নি। অন্য দিকে জনসাধারণ এক দিকে ১৯৪২ খ্রী "ভারত ছাড়" আন্দোলনের উত্তেজনা এবং অন্য দিকে মহাযুদ্ধের ঘন-ঘটার পরিপ্রেক্ষিতে মূল্য বৃদ্ধি, খাদ্যাভাব ও তেরশ পঞ্চাশের মানুষের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের পীড়নে ব্যতিব্যস্ত ছিল। এর মধ্যে খুলনা-যশোর জেলার ছোটখাট দাঙ্গার খবর পাওয়া যায় প্রধানমন্ত্রী স্যার নাজিমুদ্দীনের বিধান পরিষদে প্রদত্ত ১৯৪৪ খ্রী ১১ই জুলাই এর বিবৃতিতে। মে মাসের ঘটনার এত বিলম্বে প্রকাশ সম্ভবত যুদ্ধকালীন সংবাদ নিয়ন্ত্রণ আদেশের জন্য। ১৯৪৪ খ্রী ৯ই থেকে ২৭শে সেপ্টেম্বর গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকারকে কেন্দ্র করে জনসাধারণের আশা সৃষ্টি ও ভঙ্গের কাহিনী ছাড়াও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অতঃপর ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আলোচনার জন্য প্রথম সিমলা সম্মেলন এবং তার ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ নির্বাচনের অনুষ্ঠান ও নির্বাচন প্রচারে সাম্প্রদায়িকতার প্ররোচনা দেশের রাজনীতিতে উত্তাপ সৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ সাম্প্রদায়িক সম্পর্কেও অবনতি ঘটানো শুরু করল। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের বিচার ও মুক্তির দাবি, বোম্বের নৌবিদ্রোহে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের যে পরিবেশ তৈরী হয়, ক্ষমতা-প্রাপ্তির দ্বন্দ্বের সামনে তা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি।

১৯৪৬ খ্রী ক্ষমতা-প্রাপ্তির দ্বন্দ্বের সঙ্গে যুক্ত সর্বাপেক্ষা শোচনীয় দাঙ্গা ঘটে কলকাতা-নোয়াখালি-বিহার ও পঞ্জাব-দিল্লীতে। কিন্তু প্রদীপ জ্বালার পূর্বে যেমন সলতে পাকানর ব্যাপার থাকে, তেমনি মুসলিম লীগের "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" প্রস্তাবের ফলশ্রুতি কলকাতার ১৬ই আগস্টের দাঙ্গার পূর্বে ১২ই মার্চ কানপুরে এবং পহেলা জুলাই থেকে শুরু করে পরবর্তী কয়েক দিন আহমেদাবাদে গুরুতর দাঙ্গা ঘটে যাতে ৫৬ জন মৃত ও ৪১০ জন আহত হয়। সেকালের দাঙ্গা-প্রবণ ঢাকা শহরেও ৪ঠা জুলাই-এর দাঙ্গায় ৫ জন ছুরিকাহত হয়, যার মধ্যে ২ জন মৃত্যু বরণ করে।

কলকাতার দাঙ্গা ছিল প্রত্যুত নরমেধ যজ্ঞ। এর সূত্রপাত মুসলিম লীগ দ্বারা ঐ দিন "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম"-এর কর্মসূচী পালনে। ঐ কর্মসূচী লীগ কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত হয় পূর্বে স্বীকৃত ব্রিটীশ ক্যাবিনেট মিশনের ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার ঐ বছরের ১৬ই মে-এর প্রস্তাব অস্বীকার করার পর। কংগ্রেসও ক্যাবিনেট মিশনের হ্রস্ব মেয়াদী অর্থাৎ অন্তবর্তী সরকারে যোগ দেবার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেও দীর্ঘ মেয়াদী অর্থাৎ গণ-পরিষদের

মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব স্বীকার করেছিল। কিন্তু নূতন কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহেরু দায়িত্ব নেবার পরই হঠাৎ ঘোষণা করেন যে কংগ্রেস গণ-পরিষদে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেও তার অপরিহার্য অঙ্গ প্রদেশগুলির তিনটি গোষ্ঠীতে বাধ্যতামূলক ভাবে গোষ্ঠীবদ্ধ হবার (ক্যাবিনেট মিশন কর্তৃক কংগ্রেসের অবিভক্ত ভারত এবং মুসলিম লীগের ভারত বিভাজন করে পাকিস্তান নামক মুসলমানদের স্বতন্ত্র বাসভূমি সৃষ্টি রূপী পরস্পর বিরোধী ভূমিকার মধ্যে আপোষ রফার জন্য এক পরিকল্পনা) শর্ত স্বীকার করেনি।[১] লীগের প্রস্তাবে "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" করার কথা বলা হলেও সরকারী খেতাব বর্জন করা ছাড়া এর কোন বিস্তারিত কর্মসূচী ঘোষণা করা হয় নি। কিন্তু দেশের তখনকার সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার পরিস্থিতিতে ও বিশেষ করে লীগ তার অনুগামীদের মধ্যে বিগত দিনগুলিতে যে "লড়কে লেঙ্গে" মার্কা মনোভাব জাগিয়ে তুলেছিল এবং বিশেষত জিন্নাসহ ("আমাদেরও এখন পিস্তল আছে") লিয়াকৎ আলী খাঁ, খাজা নাজিমুদ্দীন, সর্দার আবদুর রব নিস্তার প্রমুখ লীগের ছোট বড় নেতাদের এ সম্বন্ধে অত্যন্ত প্ররোচনামূলক বক্তৃতা-বিবৃতি থেকে লীগের জঙ্গী সমর্থকেরা ঐদিন তাঁদের কী করণীয় এ সম্বন্ধে নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি অনুযায়ী বুঝে নিয়েছিল। এর উপর বিরোধী দলগুলির আপত্তি এবং এমন কি বিধান সভায় ওয়াক আউট উপেক্ষা করে দলীয় কর্মসূচীর রূপায়নের জন্য বঙ্গের লীগ সরকার প্রশাসন যন্ত্রকে কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করে এবং ১৬ই আগস্ট সরকারী ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করে "লড়কে লেঙ্গে" মানসিকতার আরও পুষ্টি সাধন করে।

১৬ই আগস্ট সকালেই (জোর করে হিন্দুদের দোকান বন্ধ করার প্রয়াসকে কেন্দ্র করে) উত্তর পূর্ব কলকাতার মানিকতলা অঞ্চলে লীগের সশস্ত্র কর্মী ও সমর্থকদের দ্বারা এক তরফা হিন্দুদের আক্রমণের যেসব ঘটনার সূত্রপাত হয়, দিন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। আর বিকেলে ময়দানে লীগের জনসভায় নেতাদের উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বক্তৃতা শুনে ফেরার পথে তো জঙ্গী সমর্থকরা উদ্দণ্ড হয়ে ওঠে। পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বক্তব্য ছিল যে তাঁদের উপর এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নির্দেশ ছিল। প্রধানমন্ত্রী (যিনি আইন-শৃঙ্খলার ভারপ্রাপ্তও বটেন) স্বয়ং লালবাজার পুলিশের কন্ট্রোল রুমে উপস্থিত থেকে পুলিশের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব নিলেও দাঙ্গার ব্যাপকতা ও বীভৎসতা কমার বদলে বৃদ্ধিই পায়। চার দিনের এই নরমেধ যজ্ঞে কম পক্ষে ৫ হাজার (মতান্তরে ১০ হাজার) নর-নারী-বৃদ্ধ-শিশু নিষ্ঠুর ভাবে নিহত, ১৫ হাজারের মত আহত, কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি ভস্মসাৎ অথবা লুণ্ঠিত ও নারীর অমর্যাদার বহু ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তার জন্য হিন্দুদের স্বধর্মীয়দের এবং মুসলমানদেরও মুসলিম অধ্যুষিত পাড়ায় বিপুল সংখ্যায় স্থানান্তরণ করে দেশ বিভাগের ভিত্তি রচনা করা হয়। বলা বাহুল্য চার দিনের এই প্রাথমিক মারণ-যজ্ঞে হিন্দু ও মুসলমান এক সঙ্গে থাকতে পারে না এবং তাই দেশবিভাগ অপরিহার্য—এই মানসিকতারও বীজবপন হয়।[২]

এই অভূতপূর্ব ভ্রাতৃহত্যার দায়িত্ব সম্বন্ধে কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকার সেই সময়কার একটি সম্পাদকীয়ের উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। পত্রিকাটিকে এ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে বাছবার কারণ সে সময়ে ব্রিটীশ মালিকানাধীন ঐ পত্রিকাকে আদৌ জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণের

সমর্থক আখ্যা দেওয়া যায় না। বরং স্টেটসম্যান যাদের মুখপত্র ছিল, বঙ্গদেশের সেই ব্রিটীশ ব্যবসায়ীরা কেবল বাণিজ্যিক স্বার্থেই লীগ মন্ত্রী মন্ডলীর সমর্থক ছিল না, প্রয়োজন পড়লেই বঙ্গীয় বিধান সভায় তাঁদের সংখ্যানুপাতে মাত্রাতিরিক্ত (ম্যাকডোনাল্ড রোয়েদাদের কৃপায়) সংখ্যক প্রতিনিধিরা প্রকাশ্যে সেই সমর্থনের প্রমাণ বার বার দিতেন। পত্রিকাটির সম্পাদকীয়তে বলা হয় : "এক মহৎ প্রদেশের রাজধানীতে যে আতঙ্কজনক নরমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল, ভারতের ইতিহাসে তা সর্বাপেক্ষা শোচনীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং আমাদের বিশ্বাস এর মূলে ছিল মুসলিম লীগ দ্বারা আয়োজিত এক রাজনৈতিক বিক্ষোভ প্রদর্শন। লীগ মন্ত্রী-মন্ডলীর অত্যন্ত সততা সহকারে এই ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেওয়া উচিত ছিল যে এ জাতীয় রাজনৈতিক বিক্ষোভ প্রদর্শন কোন রকম অশান্তি সৃষ্টির কারণ হবে না। শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা যে-কোন মন্ত্রীমন্ডলীর প্রধান কর্তব্য। আর বাংলার মন্ত্রীমন্ডলীর উপর ন্যস্ত দায়িত্বের পরিমাণ এই কারণে আরও অধিক ছিল যে মুসলিম লীগের ঘোষিত নীতি ছিল "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস"-কে শান্তিপূর্ণ রাখা। কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে এই কর্তব্য পালন করার বদলে লীগ মন্ত্রীমন্ডলীর বিভ্রান্তিকর ত্রুটি-বিচ্যুতি ও প্ররোচনামূলক কার্যকলাপের দ্বারা যেসব ঘটনা ঘটেছে তা পরিহার করার পরিবর্তে মন্ত্রীমন্ডলী বরং তার কারণ স্বরূপ হয়েছে।" [৩]

কলকাতার দাঙ্গায় সুরাবর্দীর নেতৃত্বের লীগ সরকারের দায়িত্ব ও ব্যর্থতার কথা বঙ্গীয় লীগের দুইজন প্রথম সারির নেতাও প্রকাশ্যে বলেন। ১৭ই আগস্ট ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী ও তখন লীগ সদস্য ফজলুল হক্ বিধান সভায় স্বীকার করেন যে অবস্থাদৃষ্টে "মনে হয়েছিল যে ব্রিটীশ শাসনের অবসান ঘটে গেছে।" বিহারের দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে ১৩ই নভেম্বর বঙ্গীয় লীগের সভাপতি মৌলানা আক্রাম খাঁ মন্তব্য করেন যে ঐ শোচনীয় ঘটনার প্রাথমিক দায়িত্ব সুরাবর্দীর নেতৃত্বাধীন বঙ্গের লীগ সরকারের। লীগের দলীয় রাজনীতির কারণ পূর্বোক্ত দুই নেতার সঙ্গে সুরাবর্দীর সদ্ভাব না থাকলেও তাঁদের বক্তব্য একেবারে উপেক্ষনীয় নয়।

"দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং" নামে সর্বত্র খ্যাত ঐ দাঙ্গার আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়। বঙ্গের ছোটলাট ব্যারোজ ঐ ১৬ই আগস্ট বড়লাট লর্ড ওয়াভেলকে পাঠানো এক তারবার্তায় জানান, "অস্ত্র হিসাবে প্রধানত ইঁটের টুকরো ব্যবহৃত হয়েছিল মনে হয়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই বন্দুক ব্যবহার করেছিল এবং ছুরিকাঘাতের কয়েকটি ঘটনাও জানা গেছে। এ যাবৎ যেসব গোলযোগের খবর পাওয়া গেছে তা স্পষ্টত সাম্প্রদায়িক এবং কোনক্রমেই ব্রিটীশ বিরোধী নয়—আবার বলছি ব্রিটীশ বিরোধী নয়।" লীগের "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" ইংরেজ শাসকদের বিরোধী না হয়ে নিছক প্রতিবেশী হিন্দুদের উপর এক তরফা উৎপীড়ন ও অত্যাচার রূপে আত্মপ্রকাশ করে এর বহু প্রমাণ তদানীন্তন পত্র-পত্রিকায় মেলে। প্রথম দিকে এর কিছু ব্যতিক্রমও ছিল, তবে তা রাজনৈতিক কারণে। ১৬ই আগস্টের নরমেধ যজ্ঞে সর্বাগ্রে মৃত্যু বরণ করেন শিয়ালদহ এলাকায় জনৈক বাঙালী মুসলমান যুবক। খুন-খারাবির দ্বারা নিরীহ হিন্দুদের পাকিস্তানের তাৎপর্য বোঝাতে তৎপর সশস্ত্র লীগ সমর্থকদের বাধা দিতে গিয়ে তিনি শহীদ হন। বঙ্গীয় বিধান সভার একদা স্পীকার এবং লীগ বিরোধী জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা সৈয়দ নৌশের আলীর

বাড়ীও সশস্ত্র লীগ সমর্থকদের দ্বারা অবরুদ্ধ ও বার বার আক্রান্ত হয়। বহু অনুরোধের পর পুলিশ কর্তৃক তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। ২৪শে আগস্ট সেনাবাহিনীর সহায়তায় বাড়ীর অবস্থা দেখতে এসে তিনি প্রত্যক্ষ করেন যে বাড়ীর সব জিনিসপত্র লুণ্ঠিত এবং বাড়ীটিও বিধ্বস্ত। আর বাড়ীর উপরে একটি লীগের পতাকা এবং বাড়ীটি যে মুসলিম লীগের দপ্তর—এই মর্মে একটি সাইন বোর্ড লাগান।

সেই প্রথম দাঙ্গায় ব্যাপক ভাবে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমার ব্যবহার শুরু হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পরিবেশে তা সহজলভ্য ছিল। দাঙ্গার প্রথম দিনে প্রস্তুত না থাকার জন্য প্রধানত হিন্দুরা আক্রমণের শিকার হলেও দ্বিতীয় দিন থেকে তাঁরা সংগঠিত হয়ে হাতের কাছে পাওয়া যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে একই ভাবে তাঁদের মধ্যে সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপর আক্রমণ করেন। মুসলমানদের উপর আক্রমণে শিখরাও হিন্দুদের সঙ্গী হন। তাঁদের নিয়ন্ত্রণে যেসব মোটর গাড়ী ছিল তা হিন্দুদের উদ্ধার ও ত্রাণ-কার্যে লাগার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের আক্রমণ করার জন্যও ব্যবহৃত হয়। হেন অমানবীয় অত্যাচার নেই যা দাঙ্গাকালে হিন্দুদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পরিবেশে সহজলভ্য বেআইনী আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমা, ভূতপূর্ব সৈনিকদের সেসব অস্ত্র চালাবার অভিজ্ঞতা এবং সর্বোপরি ইতিপূর্বে গুন্ডা নামে পরিচিত সমাজ-বিরোধীদের "পাড়ার ছেলে" নামে পাড়াকে রক্ষা করার অভিলাষে পাড়ার শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত যুবকদের "আত্মরক্ষার" মহৎ উদ্দেশ্যে ছুরি-বন্দুক-বোমা চালানোয় এবং সেই মানসিকতায় দক্ষ করে তোলা। বঙ্গের এবং ক্রমশ ভারতের আর সর্বত্র সমাজ-জীবনে এবং তার থেকে রাজনীতিতে একদা ভদ্রলোকের মেলা-মেশার অযোগ্য বিবেচিত অসামাজিক গুন্ডাশ্রেণীর মর্যাদালাভের সূচনা ১৯৪৬ খ্রী কলকাতার ঐ নরমেধ যজ্ঞের সময়ে। রাজনীতিতে অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ এবং সেইসব কাজে ঐ জাতীয় কার্যকলাপে দক্ষ সমাজ-বিরোধী তত্ত্বের সাহায্য নেওয়ার ইতিহাস বেশ পুরাতন। বঙ্গে স্বয়ং দেশবন্ধুর মত সর্বস্বত্যাগী নেতা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনে বিরোধীদের গুম্ করা বা বিধান সভা ইত্যাদিতে ভোটাভুটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত আটক রাখা ইত্যাদির বিরোধী ছিলেন না বলে জানা যায়। শ্রীমতী অমিয়া চৌধুরাণী (শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরীর স্ত্রী) তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে ছাত্রী স্বেচ্ছাসেবিকা হিসাবে তিনি দেখেছিলেন যে ১৯২৮ খ্রী কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কংগ্রেস অধিবেশনের সময়ে হাওড়ার শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকরা একদিন অধিবেশন স্থলে চড়াও হতে পারে খবর পেয়ে অভ্যর্থনা সমিতির নেতা শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় এক দল গুন্ডাকে আনিয়ে অধিবেশনস্থল রক্ষার দায়িত্ব তাদের উপর দিয়ে স্বয়ং তাদের কাজকর্মের তদারকি করেন।[৪] কিন্তু সমাজ ও রাজনীতিতে পেশাদার অসামাজিক ব্যক্তিদের ব্যবহার অনেকটা শিক্ষিত-সংস্কৃতিবান-সুরুচিসম্পন্ন জমিদারদের জমিদারীর স্বার্থে লাঠিয়াল পোষার মত। ১৯৪৬ খ্রী নরমেধ যজ্ঞের পর সমাজনেতা ভদ্রলোক ও অসামাজিক ব্যক্তিদের সম্বন্ধের মধ্যে একটা গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেল। তারা সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের সংক্রামিত করে সমাজের নেতৃত্ব পাবার পথে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হতে লাগল। কালক্রমে তাদের এই "অগ্রগতি" এমনই তীব্র হয়ে উঠল যে বিশ বছরের মধ্যে ভদ্রলোক রাজনৈতিক নেতাদের সহায়ক হবার বদলে

তারা স্বয়ং নেতা হয়ে কী কংগ্রেস এবং কী কংগ্রেস-বিরোধী এমন কী বামপন্থী দলেরও বিধান সভা লোকসভার সদস্য ছাড়াও মন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করতে আরম্ভ করল।

বাংলা তথা ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবক্ষয়ের সূচনা পর্ব প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বেকার কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকায় এক বিশেষ প্রতিবেদনে কুশলতা সহকারে উপস্থাপিত করা হয়। একটু দীর্ঘ হলেও উদ্ধৃতিটি মূল্যবান :

"সেই ৬য়াল ব্যক্তি, পাড়ার 'গুন্ডা' কলকাতায় আবার জাঁকিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার সৃষ্টি সম্ভবত সংগঠিত সমাজের সমসাময়িক। তবে বিশেষ বিশেষ কালের পরিবেশ অনুযায়ী তার সমৃদ্ধির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। ১৯৪৬ খ্রী কলকাতার নরমেধ যজ্ঞের সময় থেকে তার কার্যক্ষেত্র ও ক্রিয়াশীলতা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

"১৯৪৬ খ্রী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তাকে কেবল একদা সমাজ কর্তৃক নির্বাসিত ভূমিগত জগৎ থেকে আলোয় নিয়ে আসে নি, তাকে হিরো বা নায়কের ভঙ্গিমা গ্রহণ করতে সাহায্য করেছে। স্বসম্প্রদায়ের মানুষদের জীবন ও সম্পত্তিরক্ষার জন্য প্রতিরোধ বাহিনী সংগঠন করে সে নেতায় পরিণত হয়েছে। এই ছিল তার লোক দেখান উদ্দেশ্য। তার আসল লক্ষ্য অবশ্য ছিল নিজের স্বার্থে পরিস্থিতির সুযোগ নেওয়া। নিজের পাড়ায় সে 'দাদা' অভিধা অর্জন করে এবং বিপুল সংখ্যক মানুষের অপ্রচ্ছন্ন আশীর্বাদ সহকারে সে নিজের লুণ্ঠনকার্য চালিয়ে যেতে থাকে।

"সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর তুলনামূলক ভাবে একটা কর্মশৈথিল্যের কাল আসে। তবে পাড়ার গুন্ডা বহুমুখী কর্মশক্তি সম্পন্ন বলে নিজের কাজ-কর্ম জলাঞ্জলি দেবার পাত্র নয়। পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেও নিজের কর্মপদ্ধতিতে পরিবর্তন ঘটায়।

"দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে সে প্রভূত পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করেছিল এবং ছোঁড়াদের এক বাহিনীকেও সংগঠিত করেছিল যারা তাকে ভীতিমিশ্রিত শ্রদ্ধা ও প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখত। তার নিজের বোমা তৈরীর ব্যবস্থা ছিল এবং এই ভাবে সে তার ডাকাত দলকে সংগঠিত করত।

"লুঠপাট ও ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করায় তো সে সিদ্ধহস্ত। এ ছাড়াও পাড়ার গুন্ডার আগ্রহের অন্যান্য ক্ষেত্রও আছে। নিজে সে দলীয় রাজনীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আগ্রহবিহীন [৫] তবে নির্বাচনের অভিযানের সময়ে যে দল সব চেয়ে বেশী টাকা দিতে রাজী তার সমর্থনে তার চেলা-চামুন্ডাদের সেবা হাজির।

"এছাড়া উদ্দেশ্যবিহীন বিদ্বেষ সহকারে সে যে কোন প্রদর্শন ও বিক্ষোভে নির্বিচারে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং অশান্তির সময়ে পেটো-পটকা ছোঁড়ে, যাত্রী ও পথচারীদের জীবন বিপন্ন করে দিয়ে ট্রামে-বাসে আগুন ধরায়, এ সবই সে করে নিছক মজা করার জন্য।

"পাড়ার দেব-দেবীর সার্বজনীন পূজায় সে প্রমুখ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। নিজের সাঙ্গপাঙ্গদের মাধ্যমে পাড়ার লোকেদের উপর সে যে চাঁদা ধার্য করে তা দিতে যারা পূর্ণত বা আংশিক ভাবে অস্বীকার করে তাদের উচিত শিক্ষা দিতে সে কখনও ভোলে না। সে কাজে বিশ্বাসী, কথা বলে কম। তাই তার নির্দেশের অবহেলাকারীদের বোমা-পটকা বা সোডার বোতল দিয়ে যা বোঝাবার বুঝিয়ে দেয়। তর্ক-বিতর্কে সে বিশ্বাসী নয়।"

"পাড়ার গুন্ডা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তাই প্রশ্ন-পত্র কঠিন হয়েছে এই অজুহাতে পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে যাওয়া, বা রাস্তায় কোন মহিলাকে অসম্মান করা কিংবা এমন কি ফৌজদারী মামলার কোন সাক্ষীকে ভয় দেখানোর মত তুচ্ছ ব্যাপারে সে ব্যক্তিগত ভাবে জড়িত হয় না। এসব ছোট-খাট কাজ করার জন্য সে নিজের চেলা-চামুন্ডাদের উপর নির্ভর করে। তবে এসবের পিছনে তার প্রেরণা এবং নির্দেশ অবশ্যই থাকে।

"পাড়ার গুন্ডার শিক্ষার মান ও পারিবারিক পটভূমিকার কথা না বললে তার কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা না থাকলেও সে নিজেকে পাড়ার পন্ডিত ব্যক্তিদের চেয়ে কোন অংশে হীন বলে স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। সে বিশ্বাস করে যে সে শিক্ষিত। কারণ তার ধারণা শিক্ষার অর্থ কেবল ডিগ্রী-ডিপ্লোমা অর্জন করা নয়। সে মধ্যবিত্ত পরিবারের এবং সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও বলে যে সার্বজনিক জীবনে বিখ্যাত বেশ কয়েকজন ব্যক্তির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা আছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার যোগাযোগের কথা সুপরিচিত। অবশ্য এর মূলে আছে নির্বাচনের সময়ে তার সেবার অপরিহার্যতা।

"এইভাবে পাড়ার গুন্ডা নিজের পথে চলে। সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে পুলিশ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। আর জনসাধারণ তার ভয়ে ভীত।" [৬]

কলকাতার দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় চট্টগ্রাম, মৈমনসিং, বরিশাল ও পাবনা প্রমুখ জেলাতে ছোট বড় দাঙ্গা হলেও ১০ই অক্টোবর ভারতবর্ষের উত্তরপূর্ব কোণে নোয়াখালি, টিপরা, (কুমিল্লা) ও সন্দীপ এলাকায় যে এক তরফা হিন্দু-নিধন ও উৎপীড়ন পর্বের সূত্রপাত হয়, তা এর মধ্যে ভীষণতম। এর মূলেও ছিল অবশ্য রাজনীতি। কংগ্রেস বড়লাটের আমন্ত্রণক্রমে দোসরা সেপ্টেম্বর কেন্দ্রে অন্তবর্তী সরকারের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। বড়লাট ও কংগ্রেসের অনুরোধ সত্ত্বেও লীগ "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম"-এর প্রস্তাবে পরিবর্তন করে শুধু যে অন্তবর্তী সরকারে যোগ দিতে অস্বীকার করে তা-ই নয়, সেই সরকারের কার্যারম্ভের দিনটিকে কালা দিবস রূপে পালন করে। কেন্দ্রে ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হবার আক্রোশও ফুটে বেরোয় লীগ নেতাদের ঐ দিনকার বক্তৃতায়। নোয়াখালি অঞ্চলে হিন্দু-বিরোধী মানসিকতার ব্যাপক প্রচারের পিছনে আর একটি স্থানীয় রাজনৈতিক কারণও ছিল। এ হল এক শ্রেণীর মুসলমান দ্বারা পীর রূপে পুজিত লীগের স্থানীয় নেতা মিঞা গোলাম সারওয়ারের নব দীক্ষিতের উৎসাহে সাম্প্রদায়িকতার প্রচার ও সংগঠন। এ ছাড়া কলকাতার দাঙ্গায় দ্বিতীয় দিন থেকে মার খাওয়া মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনীও ইতিমধ্যে ঐ এলাকায় পল্লবিত হয়ে প্রচারিত হয়। কলকাতার দাঙ্গায় উৎপীড়িত মুসলমানদের মধ্যে অনেক নোয়াখালিবাসীও ছিলেন।

তবে বর্ণনার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য ইতিমধ্যে আর যেসব দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয় তার বিবরণ দেওয়া দরকার। লখনউ, কানপুর ও বেরিলিতে দাঙ্গাসম অবস্থার সৃষ্টি ছাড়াও ২৩শে আগস্ট এলাহাবাদের দাঙ্গায় ৪ জন মৃত ও ৪৩ জন আহত। লীগ কর্তৃক কালা দিবস রূপে উদ্‌যাপিত দোসরা সেপ্টেম্বরের এক দিন পূর্ব থেকে শুরু করে ৮ই পর্যন্ত ব্যাপক ভাবে এবং ১৭ই পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন ভাবে বোম্বেতে যে দাঙ্গা হয় তাতে মোট মৃতের সংখ্যা ২৪২ ও আহতের সংখ্যা ৬০০-এর উর্ধ্বে। কলকাতাতেও থেকে থেকে দাঙ্গার প্রকোপ।

৫ই, ১৩ই, ২২শে থেকে ২৪শে, ২৬শে থেকে ২৮শে সেপ্টেম্বর কলকাতায় একাধিক দাঙ্গার ঘটনা এবং মৃত ও আহতদের সংখ্যাও তদনুরূপ। কলকাতার এই পর্যায়ের দাঙ্গা কমে স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর গান্ধীজীর প্রয়াসে। ভারত বিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গদেশে দেশত্যাগ জনিত দাঙ্গা পঞ্জাবের মত যে এত ভীষণ হয় নি তার কারণও মহাত্মা, যার জন্য মাউন্টব্যাটেন তাঁকে "একক সীমান্তরক্ষী বাহিনী" আখ্যা দিয়েছিলেন। মহাত্মার এই সাফল্যের পিছনে সুরাবর্দীর অবদানও ছিল প্রচুর। কারণ তিনি তখন তাঁর সর্বশক্তি নিয়ে শান্তি-সদ্ভাবনা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় রত মহাত্মার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। ঢাকাতেও অনুরূপ ভাবে থেকে থেকে দাঙ্গা ও ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটে। আহমেদাবাদ ও আরও কয়েকটি অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের খবর শোনা যায়। নোয়াখালির দাঙ্গার পূর্বে ৯ই সেপ্টেম্বর টিপরা জেলায় হিন্দুদের উপর ব্যাপক আক্রমণ ও লুঠপাটের ঘটনা ঘটে। গৃহত্যাগী হয়ে হাজার হাজার নর-নারী পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে শরণ নেন।

১০ই অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে প্রায় পনের দিন একটানা এবং তারপরও গান্ধীজী ও তাঁর সহকর্মীরা ঐ প্রায় ৫০০ বর্গমাইল এলাকার গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে সংখ্যালঘু (শতকরা মাত্র ১২ জন) হিন্দুদের মনে সাহস সঞ্চার না করা পর্যন্ত এক তরফা হিন্দু উৎপীড়ন পর্ব চলতে থাকে। লীগ সরকার প্রায় এক সপ্তাহ এ খবর প্রকাশিত হতে দেন নি। ব্যাপক হত্যা (সঠিক সংখ্যা ঐ অবস্থায় জানা কঠিন) লুণ্ঠন এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনাবলীতে প্রায় ৫০ হাজার নর-নারী প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে একটি হিসাবে পাওয়া যায়। ব্যাপক বাস্তুত্যাগের ঘটনাও ঘটে ঐ এক তরফা আক্রমণের ফলে। কিন্তু এসব থেকে শোচনীয় ব্যাপার হল বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস বা অপবিত্র করা, বহু ব্যক্তিকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণ এবং সর্বোপরি বহু নারীর সম্ভ্রম নষ্ট করা ও জোর করে দাঙ্গায় সদ্যবিধবা ও তরুণী-বৃদ্ধাকে এক শ্রেণীর মুসলমানের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া। বাঙালীর এই দুঃসময় এবং বিশেষ করে নারী-জাতির অসম্মানে বিচলিত মহাত্মা গান্ধী দিল্লীতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত অতীব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ক্ষান্তি দিয়ে শ্মশানে শিবের মত নোয়াখালির ও তৎসংলগ্ন পীড়িত অঞ্চলে শান্তি মিশনের সূচনা করেন।[৭]

কলকাতার দাঙ্গায় পীড়িত বিহারী হিন্দুদের এবং তাঁদের আত্মীয় স্বজনের মাধ্যমে বিহার তো উত্তপ্ত ছিলই। ইতিমধ্যে নোয়াখালির ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়ায় প্রথমে ছাপরায় (২৫শে অক্টোবর) এবং তারপর দাবানলের মত তার বিস্তৃতি ঘটে পাটনা, মুঙ্গের, ভাগলপুর, গয়া এবং সাঁওতাল পরগনা জেলায় দাঙ্গার আগুন জ্বলে উঠল। কোথাও কোথাও মুসলমানরা আত্মরক্ষা বা সেই উদ্দেশ্য প্রতি-আক্রমণের প্রয়াস করলেও বিহারের দাঙ্গায় মুসলমানরাই এক তরফা ক্ষতিগ্রস্ত হন। রাজ্যের চীফ সেক্রেটারীর মতে দাঙ্গায় ২৬৫৫ জনের মৃত্যু নথিবদ্ধ হলেও এ সংখ্যা আংশিক এবং হত্যা করে যেসব লাশ নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে তার সংখ্যাও এর মধ্যে নেই। তবে তাঁর মতে দাঙ্গার সময়ে পুলিশী গুলিতে মৃতদের সংখ্যা ধরলেও নিহতের মোট সংখ্যা ৫ হাজারের মধ্যে সীমিত থাকার কথা। তাঁর প্রদত্ত হিসাব অনুসারে দুটি জেলার সংখ্যা বাদ দিলে আহতদের মোট সংখ্যা ৪৩৮। তিনি আরও জানান যে পুলিশ ছাড়াও দাঙ্গাগ্রস্ত এলাকায় শান্তি স্থাপনের জন্য ৮ হাজার

সৈনিককে নিয়োগ করা হয়েছিল এবং কেবল পাটনা জেলাতেই ৬৬টি গ্রামে মুসলমানদের তাবৎ গৃহে অগ্নি সংযোগ করা হয়। বিহারের দাঙ্গাপীড়িত এলাকা পরিদর্শনের পর বাংলার লীগ নেতা আবুল হাশিম জানান যে প্রায় ৫০ হাজার মুসলমান উদ্বাস্তু হয়ে আশ্রয় শিবিরগুলিতে ঠাঁই নিয়েছেন। বলা বাহুল্য বিহারের দাঙ্গায় এক জোর করে ধর্ম পরিবর্তন করা ছাড়া মুসলমানদের উপর আর সব রকমের অত্যাচার, এমন কি নারীর অসম্মানও করা হয়। গোড়াতেই দাঙ্গা বন্ধ করা ও তার প্রসার আটকানোর ব্যাপারে বিহারের কংগ্রেসী সরকারের ব্যর্থতাও উল্লেখযোগ্য। তবে অন্তবর্তী সরকারের প্রধান জওহরলালের দাঙ্গাগ্রস্ত এলাকায় ব্যাপক সফর (দাঙ্গাগ্রস্ত এলাকায় বোমা বর্ষণের হুমকি) এবং বিহারে থেকে প্রশাসনকে সক্রিয় করার ফলে অবস্থা ক্রমশ আয়ত্তে আসে। এছাড়া রাজেন্দ্রপ্রসাদ, অধ্যাপক আবদুল বারী, ডঃ সৈয়দ মাহমুদ, জয়প্রকাশ প্রমুখ বিহারের কংগ্রেসী নেতারা জনসাধারণের মধ্যে সদ্ভাবনা প্রচার করে এবং দাঙ্গা-পীড়িতদের ভিতর বেসরকারী সেবাকার্য শুরু করে প্রশাসনকে সক্রিয় হতে প্রভূত সহায়তা করেন। আর সর্বোপরি বাংলার শান্তিযাত্রা থেকে তাঁর "দ্বিতীয় জন্মভূমি" বিহারের কাছে দাঙ্গা বন্ধ করার জন্য গান্ধীর আবেদন ও ৬ই নভেম্বর ঘোষণা যে বিহারে শান্তিস্থাপন না হলে তিনি আমরণ উপবাস করবেন (পীড়িত বাঙালীদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনের জন্য ইতিপূর্বেই তিনি স্বাভাবিকদের চেয়ে কম খাদ্য গ্রহণ করছিলেন)। ১৯৪৭ খ্রী ৬ই মার্চ থেকে স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বাদশাহ খাঁ ও তাঁর খুদা-ই-খিদমদগার বাহিনী, মৃদুলা সারাভাই ও অন্যান্য কর্মীরা দাঙ্গাপীড়িত মুসলমানদের পুনর্বাসনের কাজ হাতে নেবার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের মধ্যেও সদ্ভাব সৃষ্টি করে তাঁদের মুসলমান প্রতিবেশীদের নিরাপত্তার সর্বশ্রেষ্ঠ নিশ্চয়তার ভূমিকা দিয়ে অমানিশার মধ্যে আলোক-বর্তিকা প্রজ্বলিত করার কাজে ব্রতী হলেন।

১৯৪৬ খ্রী কাহিনী শেষ করার পূর্বে ছোট বড় আরও বেশ কয়েকটি দাঙ্গার ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। কলকাতায় থেকে থেকে যে দাঙ্গা চলছিল, ২২শে থেকে ২৪শে আবার ২৭শে অক্টোবর থেকে পহেলা নভেম্বর তা উগ্র রূপ ধারণ করে। এমনি ভাবে ঢাকাতেও থেমে থেমে ভ্রাতৃহত্যা পর্ব জারি থাকে। পশ্চিম উত্তর প্রদেশে হাপুরের নিকটবর্তী গড়মুক্তেশ্বরে গঙ্গার তীরের মেলার জন্য স্থানীয় হিন্দু মুসলমান গ্রামীণ জনতা সমস্ত বছর ধরে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে থাকে। বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক পরিবেশের জন্য সেবার ৮ই নভেম্বর নাগর দোলায় চড়া নিয়ে তুচ্ছ একটা বিবাদকে কেন্দ্র করে এমন গুরুতর দাঙ্গা বেধে যায় যে তার প্রভাবে শুধু নিকটস্থ গ্রামগুলিতেই নয়, এমন কি মীরাট ও গাজিয়াবাদ হয়ে দিল্লীর উপকণ্ঠ পর্যন্ত বিবাদের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। দাঙ্গায় মোট ৪৬ জন নিহত ও ৩৯ জন আহত হয়, এর মধ্যে দিল্লীর উপকণ্ঠে দাঙ্গা থামাতে পুলিশের গুলিতে মৃত ৮ জন ও আহত ২৪ জনের (১৩ই নভেম্বর) হিসাব ধরা হয় নি। ২রা ও ৩রা ডিসেম্বর ঢাকায় দাঙ্গা ও কার্ফু। ফলে ১০জন নিহত ও ১৯জন আহত। কলকাতায় ৫ই ডিসেম্বর মোহরম শোভাযাত্রার শেষ দিনের দাঙ্গায় ৭ জনের মৃত্যু, ৮০ জন আহত। ২৯শে ডিসেম্বর এলাহাবাদে দাঙ্গা থামাতে পুলিশের গুলি বর্ষণ।

১৯৪৭ খ্রী দাঙ্গার বিবরণ দেবার পূর্বে সে সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতির অতি সংক্ষেপে

উল্লেখ করা প্রয়োজন। কারণ এসব দাঙ্গা মূলত রাজনৈতিক। বড়লাটের প্রয়াসে লীগ অক্টোবরের ২৬শে কেন্দ্রের অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিলেও এক দিকে মন্ত্রীমণ্ডলীর যৌথ দায়িত্বের নীতি মেনে কাজ করতে অস্বীকার করে সেই সরকার চলার ব্যাপারেই সঙ্কট সৃষ্টি করল, অন্য দিকে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার দীর্ঘমেয়াদী অংশ—গণপরিষদে নির্বাচিত হয়েও তার বয়কট দ্বারা লীগ তাকে ক্রিয়াশীল হতে দেবার পথে বাধা সৃষ্টি করল। ডিসেম্বরে বিবাদমান পক্ষগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে লন্ডনে বড়লাট ও ব্রিটীশ মন্ত্রীমন্ডলীর এক দফা আলোচনায়ও কোন ফল হল না। কোন পক্ষই আপোষ করতে প্রস্তুত হল না। ব্রিটীশ সরকার তারপর ৬ই ডিসেম্বরের ঘোষণায় লীগ কর্তৃক বয়কট করা গণপরিষদ দ্বারা রচিত সংবিধান "দেশের কোন অনিচ্ছুক অংশের উপর জোর করে চাপিয়ে দেবার কথা চিন্তা করা" যায় না বলে দেশবিভাগ সম্বন্ধে তাদের সমর্থনের ইঙ্গিত দিল। আর অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিও ব্রিটীশ সরকারের সেই ঘোষণার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে ১৯৪৭ খ্রী জানুয়ারী সিদ্ধান্ত নিল যে সে অবস্থায় প্রদেশগুলির অংশ বিশেষের নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী চলার অধিকার দিতে হবে। অর্থাৎ প্রদেশ-বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে ভারত-বিভাগও কংগ্রেস নীতিগত ভাবে মেনে নিল। তার উপর ব্রিটীশ প্রধানমন্ত্রী ২০শে ফেব্রুয়ারীর ঘোষণায় ভারত ছেড়ে চলে আসার সময়-সীমা নির্ধারণ ও দেশবিভাগের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এবং ৮ই মার্চ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক তাকে স্বাগত জানান ঐ দলের দ্বারা ভারতবিভাগ প্রকাশ্যে মেনে নেবার সূচনা করে। মহাত্মা গান্ধী তখন বিহারের গ্রামাঞ্চলে শান্তি স্থাপনে রত। কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তের কথা তিনি জানলেন প্রায় এক সপ্তাহ পরে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকে। ভারত বিভাজনের জন্য লীগ তো সাত বছর ধরে দাবি জানিয়েই আসছিল। ব্রিটীশ সরকার ও কংগ্রেসও পাকে-প্রকারে সেই পরিস্থিতি মেনে নেওয়ায় ধর্মের ভিত্তিতে ভারত-বিভাজন অবধারিত হয়ে উঠল। ভারত ছাড়ার সময়-সীমা নির্ধারণের পরিপ্রেক্ষিতে তাই লীগের পক্ষে মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় ক্ষমতা দখল করা জরুরী হয়ে পড়ল। পঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের মত মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে তাই এর সহজ পথ দাঙ্গার সূত্রপাত হল। আসামের মত যেখানে মুসলমানরা পুরো প্রদেশে সংখ্যাগুরু নন কিন্তু কোন কোন এলাকায় মুসলমানেরা সংখ্যাগুরু, সেখানেও এই "লড়কে লেঙ্গে" মার্কা মানসিকতার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। বলা বাহুল্য মুসলমান সংখ্যালঘু এলাকার হিন্দু উগ্রবাদীরাও মুসলমান প্রভাবমুক্ত হবার জন্য কোমর বাঁধল। কুযুক্তি হিসাবে জিন্নার বিগত ২৫শে নভেম্বরের পরামর্শ তো হাতের কাছে ছিলই যাতে তিনি লোক বিনিময়ের কথা বলেছিলেন। ভারতে গৃহযুদ্ধের স্থিতি সৃষ্টি হল।

১৯৪৭ খ্রী ৯ই জানুয়ারী ও তার পর দিবস বোম্বেতে দাঙ্গা ও পুলিশের একাধিক বার গুলি চালান। মৃত ১২ জন, আহতের সংখ্যা ১১০। ২৪শে জানুয়ারী ইউনিয়নিস্ট প্রধান মন্ত্রী খিজির হায়াৎ খাঁর দিল্লী প্রবাস কালে ছোটলাটের আদেশক্রমে পঞ্জাব সরকার কর্তৃক মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ড ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে লীগের সাত জন শীর্ষ স্থানীয় নেতাকে গ্রেপ্তার করার পর থেকে সে প্রদেশ দ্রুত এক রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে চলল। পূর্বোক্ত প্রতিষ্ঠান

দু'টির জঙ্গী সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপের প্রমাণ সে সময়ে বহুবার পাওয়া যায় এবং পাকিস্তানের "পা" বা পঞ্জাবে লীগ শাসন প্রবর্তনের জন্য সেই দলের নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে যে কোন উপায় গ্রহণ করার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিলেন। পঞ্জাব সরকারের এই পদক্ষেপের ফলে "ব্যক্তিস্বাধীনতার পুনঃ প্রতিষ্ঠার" দাবিতে লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এবং ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। খিজির শান্তি ক্রয়ের আশায় ২৬শে জানুয়ারী লীগ নেতাদের কারামুক্ত করলেন, ২৮শে প্রতিষ্ঠান দু'টির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হল। বিবাদের তাৎক্ষণিক কারণ দূর হলেও লীগের আন্দোলন কিন্তু থামল না। কারণ মূল লক্ষ্য ছিল পঞ্জাবে যেকোন উপায়ে লীগের শাসন প্রতিষ্ঠা। সুতরাং লীগের সরকার বিরোধী আন্দোলন শেষ অবধি ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত হল। পঞ্জাবের জনমত মুসলমান ও অমুসলমান দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেল এবং দোসরা মার্চ দাঙ্গা প্রশমনে অসফল খিজির হায়াৎ খাঁ ব্রিটীশ প্রধানমন্ত্রীর ২০শে ফেব্রুয়ারীর ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় পদত্যাগ করলেন। এরপর কেবল পঞ্জাবই নয়, তার প্রতিবেশী সীমান্ত প্রদেশেও গৃহযুদ্ধের স্থিতি উৎপন্ন হল।

পঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশে স্বাধীনতার প্রাক্কালে যে ব্যাপক দাঙ্গা ঘটে (যার বড় একটা অংশ সংখ্যালঘুদের উপর এক তরফা উৎপীড়ন) তার এক একটির বিবরণ না দিয়ে পরিস্থিতির সামগ্রিক চিত্র উপস্থাপিত করার চেষ্টা করা হবে। "ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে লাহোর অমৃতসর সহ ছ'টি শহরে প্রবলতর হিংসাত্মক কার্যকলাপের মাধ্যমে পঞ্জাবে বিস্ফোট তীব্রতর হল। লীগের তরুণ সমর্থকদল 'আদালত ও সাধারণ নাগরিকদের ঘর-বাড়ী আক্রমণ করে সেখানে ব্রিটীশ পতাকার বদলে মুসলিম লীগের পতাকা উত্তোলন করা শুরু করলেন। কয়েকজন পুলিশ এবং বহু সাধারণ মানুষের মৃত্যু ও আহত হবার ঘটনার পর খিজিরের মনোবল ভেঙ্গে পড়ল এবং ..... এক সর্বদলীয় মন্ত্রীসভা গঠনের আশা নিয়ে—ছোটলাট জেনকিন্সের মতে যা 'একান্তই অসম্ভব'—মুসলিম লীগের সঙ্গে (তিনি) একটা 'বোঝা পড়ার' সিদ্ধান্ত করলেন। লীগ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করেছিল, 'উচ্ছৃঙ্খল জনতা' কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী ডঃ খাঁ সাহেবের পেশোয়ারের বাড়ী ঘেরাও করে তার সবগুলি জানালা ভেঙে চুরমার করল এবং পুলিশ নিষ্ক্রিয় ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে 'গুলি চালাবার আদেশ উপেক্ষা করল।' [৮] "জেনকিন্স ৭ই মার্চ ওয়াভেলকে লিখলেন, 'গতকাল অমৃতসর নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা গেছে। সন্ধ্যা নাগাদ শহর একেবারে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।....মনে হয় শহরের অধিকাংশ অধিবাসী অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করে ফেলেছে....বহু অট্টালিকা আগুনে পুড়েছে। শহর থেকে.... পলায়নরত অসংখ্য নর-নারী বিশৃঙ্খলাকে আরও বিকট করে তুলেছে এবং....রাওলপিন্ডি থেকে.....লুঠ.....ও প্রচন্ড দাঙ্গার খবর পাওয়া গেছে, যেখানে ২৫ জন মৃত ও সম্ভবত ১০০ জন আহত। শিয়ালকোট ও জলন্ধরও দাঙ্গা-কবলিত। এসব ঘটনা সর্বদাই তিনটি স্তরের ভিতর দিয়ে যায়—প্রবল উন্মাদনা, যৎপরোনাস্তি আতঙ্ক এবং অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ।" [৯] "আশেপাশের বিধ্বস্ত গ্রামাঞ্চল থেকে হাজার হাজার উদ্বাস্তু রাওলপিন্ডিতে সমবেত হওয়া শুরু করলেন। 'অমুসলমানদের উপর আক্রমণ অত্যন্ত বর্বরতা সহকারে সংগঠিত করা হয়েছে।'—জেনকিন্স

১৭ই মার্চ এই মর্মে তারবার্তা পাঠালেন। 'রাওলপিন্ডির ডেপুটি কমিশনারের বিশ্বাস, একমাত্র তাঁর জেলাতেই হতাহতের সংখ্যা ৫০০০ হবে।' ঐদিন ছোটলাট আরও লিখলেন, যে, পঞ্জাবের দূরবর্তী অঞ্চলসমূহ থেকে ক্রমশ যে খবর আসছে তার থেকে একটা 'সংগঠন ও ষড়যন্ত্রে'র আভাস ফুটে উঠেছে। '....রাওলপিন্ডির বিভিন্ন অংশে যেন একযোগে....বিস্ফোরণ ঘটেছে....এবং সেসব যেন সুপরিকল্পিত ও নিখুঁত ভাবে কার্যকরী করা। প্রভাবিত জেলাসমূহের সব মুসলমানই মনে হয় এইসব ঘটনাবলীর সঙ্গে যুক্ত অথবা তার প্রতি সহানুভূতিশীল। সপ্তম ডিভিসনের সেনাধ্যক্ষ আমাকে বলেছেন....কোন কোন ক্ষেত্রে অমুসলমানদের প্রতি আক্রমণ সামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত অফিসার—পেনসন-প্রাপ্তদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে....। যেসব স্থানীয় সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের সঙ্গে আমি কথা বলার সুযোগ পেয়েছি....তাঁদের মুখমণ্ডল চাপা ক্রোধে কৃষ্ণবর্ণ...অমুসলমানরা সরকারী কর্মচারী এবং বিশেষ করে পুলিশদের প্রতি তীব্রভাবে বিরূপ'।" [১০]

পেনড্রেল মুনের মতে মুসলমান জনসাধারণ তখন, "....হঠাৎ যেন কোন পূর্ব-নির্ধারিত ইঙ্গিত পেয়ে নিজেদের যথার্থ স্বরূপে বাইরে বেরিয়ে এবং হাতে অস্ত্র নিয়ে ও কোথাও কোথাও লৌহ শিরস্ত্রাণ মাথায় দিয়ে এমন ব্যাপক ভাবে হত্যা লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগে প্রবৃত্ত হল যার ব্যাপকতার তুলনা পঞ্জাবের বিগত একশত বৎসরের ইতিহাসে বিরল।" [১১]

"উত্তর ভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে বঙ্গ ও বিহারের চিতা তখনও বহ্নিমান। গান্ধী এবারে (৫ই মার্চ, ১৯৪৭) মানুষের শুভবুদ্ধি ফিরিয়ে আনার আর শান্তি প্রতিষ্ঠার "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে" মিশন নিয়ে নোয়াখালি থেকে বিহারে। গান্ধীর একদল সহকর্মী নোয়াখালিতে তাঁর ব্রত চালিয়ে যাচ্ছেন। সীমান্ত গান্ধীসহ অপর একদল সহকর্মী বিহারে সাধনায় রত।"

"কিন্তু সীমান্ত গান্ধীর নিজের ঘরেই ইতিমধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। 'স্থানীয় লীগ' পরিচয়ের অন্তরালে লীগেরই ক্ষমতালিপ্সু এক গোষ্ঠী আইনসঙ্গত কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলকে পদত্যাগে বাধ্য করার জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করে দিয়েছে। প্রদেশের শহর ও গ্রামাঞ্চলে অমুসলমানদের উপর ব্যাপক নিপীড়ন ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেছে। কাজ চালানো গোছের আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য সেনাবাহিনীকে তলব করতে হচ্ছে। তবুও পেশোয়ারের পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে অমুসলমানদের হত্যা লুঠপাট ও তাদের সম্পত্তিতে অগ্নিসংযোগ বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না। হাজারা জেলাতে বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ এবং মন্দির ও গুরুদ্বারা ভস্মসাৎ করার ঘটনার বিবরণ পাওয়া গেছে। ছোটলাট ক্যারো লীগের আন্দোলনকে প্রোৎসাহিত করেছেন বলে তাঁকে অবিলম্বে পদচ্যুত করার জন্য ১৯শে মার্চ নেহরু বড়লাটকে লিখলেন।"[১২]

৩রা জুন কংগ্রেস লীগ ও আকালী দল দেশবিভাগ করে ভারত ও পাকিস্তান নামের দুটি রাষ্ট্রের হাতে ইংরেজের ক্ষমতা হস্তান্তর করার প্রস্তাব মেনে নেবার পর পঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশে ব্যাপক দাঙ্গা হত্যা লুণ্ঠন অগ্নিসংযোগ এবং সম্ভবত পৃথিবীর ইতিহাসে বৃহত্তম বাস্তুত্যাগ-পর্ব [১৩] আরম্ভ হয়ে গেল। কিছু দিন পর র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ ঘোষিত হতেই এই দাঙ্গা, হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ ও বাস্তুত্যাগ দাবানলের মত ব্যাপক

হয়ে পড়ল। মুসলমান সংখ্যাগুরু এলাকায় হিন্দু-শিখদের উপর এক তরফা উৎপীড়ন এবং হিন্দু-শিখ সংখ্যাগুরু অংশে মুসলমানদের উপর এক তরফা নিগ্রহ এবং যেন জিন্নার তত্ত্বকে ব্যঙ্গ করে তাঁর ভাষায় "হিন্দু জাতি", "মুসলমান জাতি" ও "শিখ জাতি"-দের স্বীয় বাসভূমির খোঁজে সদ্য স্বাধীন কোন দেশের সরকার প্রকাশ্য ভাবে না চাইলেও সরকারী নেতাদের উপদেশ-আবেদনকে অগ্রাহ্য করে জনসাধারণের বাধ্যতামূলক লোক বিনিময়, এই শতাব্দীর ভারতে সর্বাপেক্ষা শোচনীয় মানবিক ট্রাজিডি। এই ট্রাজিডির ব্যাপকতা দাবানলের মত স্বাধীনতার পরও নভেম্বর পর্যন্ত ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ভাগ এবং এমন কি স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের রাজধানী দিল্লী ও তার সন্নিহিত অঞ্চলকে গ্রাস করে রইল। ১০ই মার্চ অসমেও একই উদ্দেশ্যে লীগ যে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেছিল জনসমর্থনের অভাবে তা অবশ্য তেমন গুরুতর রূপ ধারণ করতে পারে নি। কিন্তু পূর্বাঞ্চলের অগ্নিগর্ভ বঙ্গ-বিহারে যে পঞ্জাব-সীমান্ত প্রদেশের ছিন্নমস্তাবৃত্তির পুনরাবৃত্তি হয় নি, তার প্রধান কারণ পূর্বে উল্লিখিত মাউন্টব্যাটেনের "একক সীমান্তরক্ষী বাহিনী"—মহাত্মা গান্ধীর শান্তি মিশনের সম্ভাবনা সৃষ্টির প্রয়াস।

ভারত-বিভাগকালীন দাঙ্গার ক্ষয়-ক্ষতির সম্পূর্ণ খতিয়ান পেশ করার পূর্বে এই পর্বে অমানবীয় ভ্রাতৃহত্যার অন্যতম পীঠস্থান ভারতের রাজধানী দিল্লীর স্বাধীনতা-পূর্ব ও পরবর্তী শোচনীয় অবস্থার একটা ধারণা দেওয়া হবে। এ বিবরণ এক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাঙালী পন্ডিত ও লেখক শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরীর সংবেদনশীল হৃদয়ের আর্তির বাঙ্ময় রূপ বলে এর সবিশেষ মূল্য। আর এ কোন স্মৃতিকথন নয়, দিল্লীর অগ্নিস্নানের প্রত্যক্ষদর্শী নীরদবাবু কর্তৃক সেই সময়েই লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল বলে এর ঐতিহাসিক গুরুত্বও সবিশেষ। নীরদবাবু তখন পুরাতন দিল্লীর দেওয়াল ঘেরা অংশের বাসিন্দা এবং প্রত্যহ সরকারী চাকুরী উপলক্ষ্যে তাঁকে নূতন দিল্লী যেতে হয়। স্বাধীনতার প্রাক্কালে দিল্লীতেও দাঙ্গা শুরু হয় এবং ১৯৪৭ খ্রী মার্চ-এপ্রিল থেকে পশ্চিম পঞ্জাব থেকে হত্যা লুণ্ঠন নারীহরণ ইত্যাদির শিকার হিন্দু ও শিখ উদ্বাস্তুদের মধ্যে হাজার হাজার নর-নারীকে যখন নিরাশ্রয় ও নিঃস্ব অবস্থায় এসে দিল্লীতে সমবেত হতে হয় তখন শহরে উত্তেজনা প্রবলতর হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের উপর চাপও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঐ বিপুল সংখ্যক অসহায় এবং রুষ্ট ক্ষুব্ধ নর-নারীর জন্য অবিলম্বে আহার বাসস্থানের ব্যবস্থা করা সরকার বা তাবৎ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান—কারও পক্ষে সহজ ছিল না। আর তাদের হৃদয়ের ক্ষত নিরাময়ের ব্যবস্থা করা তো দীর্ঘকালীন ব্যাপার। দিল্লীতে দাঙ্গা কার্ফু আগে থেকেই চলছিল। ১৯৪৭ খ্রী আগস্টের শেষ দিন থেকে শহরে উত্তেজনা প্রবল রূপ ধারণ করেছিল। অতঃপর নীরদবাবুর বিবরণ থেকে উদ্ধৃতি :

"..... রবিবার ৭ই সেপ্টেম্বর অবস্থার এমন অভাবনীয় অবনতি ঘটল, যার আশা আমি আদৌ করতে পারি নি। ভারতের রাজধানীতে যে এ জাতীয় ঘটনা ঘটতে পারে, তা আমি বিশ্বাস করতে পারি নি। কয়েকজন আমাকে বলেছেন যে এসব ঘটনা পূর্ব পরিকল্পিত ও পূর্ব ব্যবস্থিত। দাঙ্গার যে ভাবে সৃষ্টি ও বিস্তার ঘটে এবং যেভাবে একটানা তা চলতে থাকে তাতে পূর্বোক্ত অভিযোগ বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। যাই হোক, দিল্লীতে যা ঘটে তার

পিছনে শহরের প্রায় তাবৎ হিন্দু ও শিখ জনসাধারণের নৈতিক সম্মতি ছিল। আর সম্ভবত পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের নৈতিক সম্মতিরও বেশী কিছু ছিল এসব ঘটনা ঘটার পিছনে।"

সেই দিন নীরদবাবু যখন অন্যান্য দিনেরই মত সাইকেলে চড়ে তাঁর কর্মস্থলে যাচ্ছেন তখন কয়েকজন পথচারী তাঁকে কনট প্লেসে যেতে নিষেধ করলেন। কারণ সেখানে তখন নাকি দাঙ্গা হচ্ছে। তাঁদের কথাকে তিনি গুজব মনে করে এগিয়ে চললেন। কারণ শহরের প্রাণকেন্দ্র কনট প্লেসে দাঙ্গা হচ্ছে এ তাঁর বিশ্বাস হল না। কনট প্লেসের পথে অথবা এমন কি সেখানে পৌঁছান পর্যন্ত জনহীন পথ ছাড়া অস্বাভাবিক কিছু তাঁর নজরে পড়েনি। অতঃপর আবার নীরদবাবুর বিবরণের উদ্ধৃতি :

"..... কিন্তু হঠাৎ উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখতে পেলাম যে পুরুষ, রমণী এবং শিশুরা দোতলা ও তিন তলার বারান্দায় ভীড় করে নীচের দিকে কিছু দেখছে।....আর কয়েক গজ যাবার পূর্বেই আমি কাঠের দরজা-জানালার পাল্লা ভাঙ্গার শব্দ শুনতে পেলাম। দেখলাম একদল লোক তোরণ-শ্রেণীর ভিতরে কোণের একটি দোকান ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে পড়েছে আর দুই তিন জনের দলে অন্যেরা ছুটে সেদিকে যাচ্ছে। এক ঝলক দেখতেই অবস্থাটা বুঝতে পারলাম। কনট প্লেসে লুঠ-পাট শুরু হয়ে গেছে এবং লুণ্ঠনকারীরা নিরাপত্তা ও সাফল্যের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি পেয়ে গেছে। ভারতবর্ষের একেবারে ভীরু সম্প্রদায়ের মানুষের হৃদয় বলিষ্ঠতর হয়ে ওঠে নি একথা ঠিকই। তবে প্রকাশ্য ডাকাতি ও হিংসায় অংশ গ্রহণ করার জন্য ভীতুদের বীর হবার প্রয়োজন ছিল না।

"লুণ্ঠনকারীরা স্পষ্টত কাছের ফ্ল্যাট সমূহ ও চাকরদের কোয়ার্টার্স থেকে এসেছিল। এর পূর্বে কোণের অন্য দোকানগুলি লুণ্ঠিত হয়েছিল। দুইজন ভাল পোশাক পরা মধ্যবিত্ত ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম যারা হাসতে হাসতে চলে যাচ্ছিলেন এবং নূতন একটি মেয়েদের হাত-ব্যাগ তাঁদের একজন বগলদাবা করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। অন্যেরা মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রীর বোতল, বোনার পশম, ফাউন্টেন পেনের কালি ও ঐ জাতীয় জিনিস নিয়ে যাচ্ছিলেন। লুণ্ঠনক্রিয়া দ্রুত হলেও সুচিন্তিত কার্য ছিল। সাহায্যের জন্য আমি চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করলাম। কিন্তু আশেপাশে কোথাও একজনও পুলিশ কর্মচারী দেখতে পেলাম না।

"হঠাৎ রাইফেল হাতে জনৈক পুলিশকে ছুটে যেতে দেখে আমি দ্রুত সাইকেল চালিয়ে তার কাছে গেলাম। মোড় ফিরতেই দেখি দুটি লরি দাঁড়িয়ে আছে যার একটিতে সশস্ত্র পুলিশদল এবং অন্যটিতে টিয়ার গ্যাসের গুলি ছোঁড়ার বাহিনী। জনৈক ম্যাজিস্ট্রেট বা উচ্চ পদস্থ পুলিশ অফিসার লরিটি থেকে নামছিলেন। পুলিশ অতঃপর সক্রিয় হল দেখে অথবা হবে অনুমান করে আমি গণ্ডগোলের এলাকা ছেড়ে পার্লামেন্ট স্ট্রীটের দিকে জোর পায়ে সাইকেল চালালাম। যেতে যেতে দেখলাম যে সৈন্যবাহিনী ভর্তি অনেক লরি পূর্ণ গতিতে কনট প্লেসের দিকে ছুটে চলেছে। কিন্তু এও চোখে পড়ল যে দলে দলে যুবক একই দিকে ধাওয়া করছে, যেন তারা কোন বড় গোছের তামাশা দেখতে চলেছে। তাদের মধ্যে একটি দল আমার কাছে জানতে চাইল যে কোন কিছু আমার নজরে পড়েছে কি

না? আমি যখন তাদের কোণের দোকানগুলি লুঠ হয়ে যাওয়ার কথা বললাম এবং জানালাম যে মধ্যবিত্ত পরিবারের লোকেরা হাত ব্যাগ, মুখে মাখার পাউডার এবং ক্রিম ও এসেন্সের বোতল নিয়ে যাচ্ছে, তারা তখন প্রশান্ত উল্লাসের হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সবাই ভাল ভাবেই জানত যে কোণের ঐ দোকানগুলি প্রধানত মুসলমানদের মালিকানাধীন।

"অফিসে পৌঁছে দেখলাম মুসলমান কর্মচারীরা আতঙ্কের দ্বারা অভিভূত। তাঁরা এবং অন্যেরাও বলাবলি করছিলেন যে পুলিশের সদর কেন্দ্রে চতুর্দিকে থেকে বহু মৃত ও আহতদের নিয়ে আসা হচ্ছে। সমস্ত দপ্তর আতঙ্কে ভরা গুজবে সরগরম ছিল। আধ ঘন্টার মধ্যে নিজের কাজ শেষ করে আমি বাড়ী ফেরার জন্য রওনা হলাম। কয়েকজন আমার কাছে এসে ওভাবে সাইকেলে একা একা যাওয়ার বিপদের ঝুঁকি না নিতে মিনতি জানালেন। যতটা পারি তাঁদের ভরসা দিয়ে আমি পার্লামেন্ট স্ট্রীট ধরে এগোলাম। পুলিশের সদর কেন্দ্রের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে সেখানে লরি ভর্তি সৈন্যদলকে দেখতে পেলাম। কোন মৃত বা আহত ব্যক্তিকে দেখতে না পেলেও লক্ষ্য করলাম যে সদর কেন্দ্রের লনে একদল মুসলমান টাঙ্গাওয়ালা গাদাগাদি হয়ে বসে আছেন এবং তাঁদের চোখ-মুখে ভীত সন্ত্রস্ত ভাব। কারণ সকালের দিকে সমস্ত টাঙ্গাগুলিকে পোড়ান হয়েছে এবং তার মুসলমান চালকদের হত্যা করা হয়েছে।

"আরও এগোনর সঙ্গে সঙ্গে আমি নিয়মিত ভাবে গুলি চালনা ও বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেলাম। স্পষ্টত ধারে কাছে গুলি চলছিল ও টিয়ার গ্যাসের বোমা ছোঁড়া হচ্ছিল। সাইকেল চালিয়ে কনট প্লেসে প্রবেশ করতেই দুটি সামরিক বাহিনীর লরির সৈন্যরা আমার পথ আটকাল। আমি আমার পাশ তুলে ধরে দেখালাম এবং চেঁচিয়ে বললাম যে আমি সরকারী কর্মচারী, কাজে বেরিয়েছি।.... তখনও আমি আমার চতুর্দিকে গুলি চালনার আওয়াজ পাচ্ছিলাম। কিন্তু যা আমাকে আশ্চর্যান্বিত করছিল তা হচ্ছে লুণ্ঠনকারীদের অসাধারণ স্থৈর্য ও প্রশান্তি। পুলিশ অথবা সৈন্যদল হাজির হলে তারা আনাচে-কানাচে গা ঢাকা দিচ্ছিল এবং তারপর অসংলক্ষ্য জলের মত আবার ছড়িয়ে পড়ছিল। পরের দিন জানতে পারলাম যে বেলা এগারটা আন্দাজ অর্থাৎ আমার কনট প্লেস দিয়ে চলে আসার আধ ঘন্টা পরে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু স্বয়ং ওখানে হাজির হয়েছিলেন এবং তাঁর হাতের লাঠির সাহায্যে কিছু সংখ্যক লুণ্ঠনকারীকে হটিয়েও ছিলেন। কিন্তু তবুও সন্ধ্যা অবধি ক্ষেপে ক্ষেপে লুণ্ঠনকার্য জারি ছিল।

"মিন্টো স্ট্রীটে প্রবেশ করে দেখলাম যে ভারত সরকারের কেরানীদের কোয়ার্টার্সগুলির ঠিক মাঝখানে—বাউণ্ডুলে বা ভবঘুরেদের আস্তানা থেকে অনেক দূরে দুটি টাঙ্গা জ্বলছে।....

"তবে ভারতের অন্যত্র যা ঘটেছিল এবং পরে দিল্লীতে যার পুনরাবৃত্তি ঘটে তার তুলনায় আমি যা দেখেছিলাম তা কিছুই নয়। তবে যা দেখেছিলাম তাতেই আমি গুরুতর মানসিক আঘাত পেয়েছিলাম। এ আঘাত এত গুরুতর ছিল যে বাড়ী পৌঁছেই আমি ভেঙে পড়লাম এবং ভীষণ ভাবে কাঁদতে লাগলাম। প্রত্যুত আমি শিশুর মত চেঁচিয়ে কাঁদছিলাম আর কাঁদতে কাঁদতে বলছিলাম যে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে সরকারের কেন্দ্রস্থলের এক মাইলের ভিতর এমন প্রকাশ্য ভাবে বিনা বাধায় লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ আর হত্যালীলা চলবে আর

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বদলে "কলকাতার অলৌকিক কাণ্ড"—অভূতপূর্ব সাম্প্রদায়িক সদ্ভাবনার দৃষ্টান্ত। কয়েক দিন পরে আবার দাঙ্গা এবং গান্ধীজীর নৈতিক অস্ত্র—প্রায়োপবেশনের শরণ নেওয়া। কলকাতাবাসীর বিবেক জাগ্রত। আবার সদ্ভাবনার পরিবেশ সৃষ্টি। ইতিমধ্যে সদ্য স্বাধীন ভারতের রাজধানী দিল্লীই বিপন্ন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন রাজধানীকে গ্রাস করতে উদ্যত। পুলিশ ও সামরিক বাহিনী অসহায়। নেতাদের জরুরী তলব পেয়ে গান্ধীজী ৯ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে। শান্তি মিশনের এক ভিন্ন রূপ সেখানে। স্থানীয় মুসলমানদের সাহস ও ভরসা দিয়ে স্বস্থানে রাখা এবং বুকে অসহ্য জ্বালা নিয়ে অসহায় উদ্বাস্তু রূপে আগত শিখ ও হিন্দুদের চোখের জল মোছান এবং তাদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা করা। এর মধ্যে (পশ্চিম) পাকিস্তানে গিয়ে হিন্দু-শিখদের উপর উৎপীড়ন ও তাদের বাস্তুত্যাগ বন্ধ করার শান্তি-মিশনের প্রস্তুতির জন্য নিজ দূত হিসাবে মুসলিম লীগের একদা প্রথম সারির দুই নেতা সুরাবর্দী ও খলিকুজ্জমাঁকে পাকিস্তানের স্রষ্টা ও অবিসংবাদী নেতা জিন্নার কাছে পাঠান। দিল্লীতে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৪৮ খ্রী জানুয়ারীতে আবার অনশন। অবস্থার উন্নতিতে এবং হিন্দু-শিখ-মুসলমানদের নেতাদের মিলে-মিশে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করার প্রতিশ্রুতি লাভের পর অনশন ত্যাগ। কিন্তু ৩০শে জানুয়ারী মুসলিম বিদ্বেষে জর্জর প্রায়োন্মাদ এক হিন্দু সাম্প্রদায়িক আততায়ীর গুলিতে মহামানবের পার্থিব শরীরের বিনাশ। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অনল-কুণ্ডে মহাত্মার আত্মাহুতির পর দিল্লী তথা সমগ্র ভারতের সেই পর্যায়ের বহ্নিবন্যার সমাপ্তি।

পাদটীকা

১. এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণের জন্য লেখকের পূর্বোক্ত গ্রন্থের ২৩৩-৪০ পৃ দ্রষ্টব্য।

২. এইচ. ভি. হডসনের মতে (The Great Divide ; অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী [১৯৮৮] ; পৃ ১৬৬)। কলকাতার দাঙ্গায় মৃত ও গুরুতর আহতদের সংখ্যা ২০,০০০। এই অধ্যায়ের কলকাতা-নোয়াখালি-বিহারের দাঙ্গার বিবরণ লেখকের সমগ্রন্থ এবং নৃপেন্দ্রনাথ মিত্র (সঃ) The Indian Annual Register-এর ১৯৪৬ খ্রী ; দ্বিতীয় খণ্ড ; পৃ ১৮২-২১৪ অবলম্বনে রচিত। কলকাতার দাঙ্গার বিস্তারিত বিবরণ এবং বিশেষ করে তার পটভূমির মূল্যবান বিশ্লেষণের জন্য দ্রষ্টব্য : ডঃ সুরঞ্জন দাস ; সমগ্রন্থ ; পৃ ১৬১-৯২। সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের নামও—The Convergence of Elite and Popular Communalism—তাৎপর্যপূর্ণ।

৩. Origin of the Fearful Carnage ; ২০ শে আগস্ট, ১৯৪৬। এর দুই দিন পূর্বেও ঐ পত্রিকায় অনুরূপ মর্মে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়।

৪. মাসিক "কথাসাহিত্য" ; অগ্রহায়ণ, ১৩৯৭ ; পৃ ৫৫।

৫. পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে পরবর্তী কালে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।

৬. The Local Bully Again Flourishes ; ৩রা জুন, ১৯৫৪ খ্রী।

৭. নোয়াখালি প্রসঙ্গে ডঃ সুরঞ্জন দাসের সমগ্রন্থ ; পৃ ১৯২-২০৬-ও উল্লেখযোগ্য।

৮. লেখকের সমগ্রন্থ ; তৃতীয় সংস্করণ ; পৃ ২৬৫। উদ্ধৃতি-চিহ্নের ভিতরস্থ অংশ ভারত-সচিবের কাছে পঞ্জাবের ছোটলাট জেনকিন্সের পাঠান ২৫শে ফেব্রুয়ারীর প্রতিবেদন থেকে।

৯. সমগ্রন্থ ; পৃ ২৬৬।

১০. সমগ্রন্থ ; পৃ ২৬৬-৭।

১১. Divide and Quit থেকে সমগ্রন্থের ২৬৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

১২. সমগ্রন্থ ; পৃ ২৬৭।

১৩. বেসরকারী ভাবে লোকবিনিময়ের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করে একদা সরকারী ভাবে লোকবিনিময়ের প্রবক্তা স্বয়ং জিন্নাও ঐ সময়ে রক্তস্নানে রত কেবল পঞ্জাবেও মাউন্টব্যাটেনের এতদসম্বন্ধিত প্রস্তাব— "এমন কি এর সম্বন্ধে পরিকল্পনার সূত্রপাত করার প্রস্তাবে" রাজী হন নি। দ্রঃ ক্ষমতা হস্তান্তর সম্বন্ধে ব্রিটীশ সরকারের কাছে মাউন্টব্যাটেনের সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ খ্রী শেষ প্রতিবেদন। জওহরলাল ও তাঁর সহকর্মী কংগ্রেস নেতারা বরাবরের মত তখনও লোকবিনিময়ের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু লীগের কোন নেতাই লোকবিনিময়ের প্রস্তাবে আর রাজী হন নি। হডসন ; সমগ্রন্থ ; পৃ ৫৫১।

১৪. সমগ্রন্থ ; পৃ ৮৩৯-৪৫। নীরদচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের গ্রন্থে দাঙ্গার সময়ে দিল্লীতে দেখা অসুস্থ মানসিকতার আরও কিছু প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ আছে। এর মধ্যে জংশন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পুলিশ-সৈন্যদলের এক রকম নাকের নীচে প্রাণভয়ে পলায়নরত মুসলমানদের হত্যা ও তাদের রক্তাক্ত মৃতদেহের প্রতি অন্য হিন্দু যাত্রীদের নিস্পৃহতা এবং যমুনা পুল এলাকায় ক্রোড়ে শিশু নিহত মুসলিম মাতার শব দৃষ্টে সন্তানের জননী শিখ মহিলার উল্লাস ইত্যাদি প্রমুখ।

১৫. লেখকের সমগ্রন্থ ; পাদটীকা ২৯ ; পৃ ৩০৯-১০।